হরিনাভি স্কুল

ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর

‘এখানে আমাদের ছাত্রগণ শুধুমাত্র বিদ্যা নহে,

তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে, তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী বর্ষে প্রেরিত বার্তা

হরিনাভি স্কুল

ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর

সম্পাদনা

মির্জা রফিউদ্দিন বেগ

রাজকুমার চক্রবর্তী

সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগিতায়

অতীন্দ্র দানিয়াড়ী সৈকত চক্রবর্তী

মুকুল চক্রবর্তী অর্ণব নাথ সুমন্ত নায়েক

হরিনাভি ডি ভি এ এস হাইস্কুল

হরিনাভি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কলকাতা-৭০০১৪৮

অনুষ্টুপ

২ই নবীন কুণ্ড লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

খেলার মাঠে

সৈকত চক্রবর্তী

হরিনাভি স্কুলের কথা বললে প্রথমেই স্কুলের মাঠটার কথা মনে পড়ে। এই মাঠের নাম কালীকৃষ্ণ স্মৃতি উদ্যান। কিন্তু এই নাম এখন ক'জনের মনে আছে! হরিনাভি মাঠ বলেই সবাই এই মাঠকে চেনেন। হরিনাভি ক্লাব ও হরিনাভি স্কুল উভয়েই এই মাঠ ব্যবহার করে। ১৯৩১ সালে এই মাঠটি স্কুল কর্তৃপক্ষ কিনেছিলেন, মূল্য দিতে হয়েছিল প্রায় তিন হাজার টাকা। 'বঙ্গের রত্নমালার'র লেখক ও মেট্রোপলিটান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে এই মাঠের নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি স্কুল পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

তার আগে স্কুলের নিজস্ব কোনও মাঠ ছিল না। ১৯২৫ সালে ৬০ বছর-পূর্তি উপলক্ষে বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুল। খেলা হয়েছিল মিন্টো গ্রাউন্ডে। কলকাতার কোনও মাঠের নাম ছিল মিন্টো গ্রাউন্ড। রবীন্দ্র সদনের কাছে মিন্টো পার্ক ছাড়াও ভবানীপুরে আরেকটি মিন্টো পার্ক ছিল। এই জায়গাগুলির মধ্যে কোনও-একটি জায়গা হয়ে থাকতে পারে। জানা যায়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত কলকাতার কিছু স্কুলও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এটি অনুমান মাত্র। না হলে রাজপুর-সোনারপুরেরই কোনও মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারত। অবশ্য এখনকার বড় ক্লাবগুলির মাঠ, যেমন জগদ্দল, রাজপুর বা সোনারপুর চাঁদমারি মাঠের অস্তিত্ব তখন ছিল না। এগুলি পরবর্তীকালে বানানো হয়। কিন্তু গ্রাম-দেশে মাঠের অভাব থাকার কথা নয়, খেলবার জন্য মিন্টো গ্রাউন্ড অবধি যাওয়ার দরকার পড়ত না নিশ্চয়ই।

স্কুলের মাঠটি আগে এতটা বড়ো ছিল না। মাঠের পূর্বদিকে একটি পুকুর ছিল। আটের দশকের শেষে সেই পুকুরটি বুজিয়ে মাঠটিকে আরও প্রসারিত করা হয়।

আগে স্কুলের ছাত্ররা আরেকটি মাঠেও খেলত—স্কুলভবনের পিছন দিকে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের মাঠে। আটের দশকের শেষে জায়গাটিতে টেলিফোনের বিশাল

টাওয়ার বসে, অফিসও খোলা হয়। খেলার জায়গা কমে যাওয়ার অভাব পূরণ হয়ে গিয়েছিল স্কুলের নিজস্ব মাঠটির আয়তন বাড়ায়।

বিশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই বিপ্লবী সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে। তৈরি হয়েছিল বিপ্লবী আখড়া, ক্লাব। সেখানে বিভিন্ন রকম শারীরিক কসরত, ব্যায়াম, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা শেখানো হত। এসব জায়গায় অনেক যুবক ও কিশোর যেতেন শরীরচর্চা করতে। তাঁদের অনেকেই ছিলেন হরিনাভি স্কুলের ছাত্র। হরিনাভির মোতিলাল বসু এই ধরনের শরীরচর্চার পথিকৃৎ। পরে তিনি সার্কাসের দল খুলে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তখন থেকেই ব্যায়াম ও শরীরচর্চার বহমান একটি ধারা এই অঞ্চলে তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে 'ভারতশ্রী' হয়েছিলেন রাজপুরের কমল ভাণ্ডারী। ১৯৫৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেছিলেন। কমল ভাণ্ডারী ছিলেন হরিনাভি স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, ১৯৪৭ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শরীরচর্চার এই ধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়তে থাকে। গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত নিভু নিভু করে হলেও তা টিকে ছিল।

বিশ শতকের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে বিভিন্ন লোকক্রীড়া ছাড়া জনগণের খেলা বলতে ছিল ফুটবল। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড জয়ের পরে এই সব অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম খালি পায়ে ধুতি পরে লোকে ফুটবল খেলত, পরে আসে হাফপ্যান্ট বুটজুতো। পাঁচের দশকের শুরুতে হরিনাভি স্কুল বড়ো একটি আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করেছিল। হরিনাভি-রাজপুর অঞ্চলে ফুটবল খেলার একটি বলিষ্ঠ ধারা সম্ভবত এই সময় থেকেই তৈরি হয়। এই স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ মিত্র তখন কলকাতা ময়দানের নামী ফুটবলার। ছয়ের দশক থেকে হরিনাভি-রাজপুর অঞ্চল একের-পর-এক দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় তৈরি করতে থাকে। তাঁদের অনেকেই হরিনাভি স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

সেই সময়েই স্থানীয় ক্লাবগুলিকে নিয়ে জেলা ফুটবল লিগ খেলা শুরু হয়েছিল। এই লিগের খেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে তুমুল উন্মাদনা তৈরি হত। মাঠ ভরে যেত উৎসাহী দর্শকে। অনেক সময় খেলা নিয়ে গোলমালও বেধে যেত। দূরের গ্রামে লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে জিতে আসা যেত না প্রায়শই, স্থানীয় ক্লাব হেরে গেলে গ্রামবাসীরা অতিথি ক্লাবের খেলোয়াড় ও তাঁদের সঙ্গে আগত অল্প কয়েকজন সমর্থকের ওপর

চড়াও হতেন। 'ধন্যি মেয়ে' নামে ছায়াছবিটি এই ধরনের ঘটনাকে উপজীব্য করেই বানানো হয়েছিল। জেলা লিগে হরিনাভি ক্লাবের হয়ে যাঁরা খেলতেন তাঁরা প্রায় সকলেই হরিনাভি স্কুলের ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্র। তেমনই পাশাপাশি রাজপুর, জগদ্দল, গোবিন্দপুর বা সোনারপুর ক্লাবের হয়েও স্কুলের অনেক প্রাক্তন ছাত্র খেলতেন।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন বা পরবর্তীকালের সুপার ডিভিশনেও এই স্কুলের অনেক প্রাক্তন ছাত্র সাফল্যের সঙ্গে বছরের-পর-বছর খেলেছেন। যেমন প্রদীপ মিত্র, চন্দ্রনাথ ঘোষ, উজ্জ্বল রক্ষিত, অতনু ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, ইন্দ্রজিৎ মিত্র, পিন্টু নাথ, রূপক চৌধুরী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সমীর চৌধুরী, তাপস দত্ত, রাজীব দে, শঙ্কর ভট্টাচার্য, শান্তনু সোম, শাশ্বত দত্ত, পূর্ণেন্দু দত্তবর্মণ, সুমিত চক্রবর্তী, অয়ন মিত্র প্রমুখ। এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র গোবিন্দ মিত্র ওড়িশার হয়ে বেশ কয়েকবার সন্তোষ ট্রফি খেলেছেন। অতনু ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র ও প্রশান্ত চক্রবর্তী ভারতের জাতীয় ফুটবল দলে খেলেছেন। অমিত ভদ্র দীর্ঘদিন জাতীয় দলের স্টপার ছিলেন, জাতীয় দলের হয়ে একবার অধিনায়কত্বও করেছেন। অতনু ভট্টাচার্য আটের দশকের শুরুতে এশিয়ান অলস্টারে খেলেছিলেন। আটের দশকে রাজীব দে স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমির জুনিয়ার দলের হয়ে ইউরোপ সফর করে এসেছিলেন। উল্লিখিত খেলোয়াড়দের বেশিরভাগই কেউ বাংলা বা কেউ রেলওয়ের হয়ে জুনিয়র বা সিনিয়র দলে খেলেছেন। ইন্দ্রজিৎ মিত্র জুনিয়র ভারতীয় দলে ছিলেন, পরে সিনিয়র বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিও খেলেছেন। বর্তমানে বিখ্যাত ফুটবলার শুভাশিস বোসও হরিনাভি স্কুলের ছাত্র।

স্কুলের খেলায় এঁদের অনেকের প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এঁদের উপস্থিতির কারণে হরিনাভি স্কুলের টিম হত শক্তিশালী। কিন্তু পাশাপাশি রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুল বা কামরাবাদ স্কুলের টিমও ছিল খুব ভালো। গড়িয়ার বরোদাপ্রসাদ স্কুলের টিমও হেলাফেলার ছিল না। হরিনাভি স্কুলের টিমে যখন অতনু ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র বা চন্দ্রনাথ ঘোষ খেলছেন তখন বিপরীতে রয়েছেন প্রতাপ ঘোষ বা অরুণ নাথের মতো পরবর্তীকালের নামী ফুটবলাররা।

স্কুলের খেলা ঘিরে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যেত। মাঠে ছাত্রদের মতোই সমান তালে স্কুল-টিমের হয়ে গলা ফাটাতেন শিক্ষকেরা। বিশেষ করে রাজপুর বিদ্যানিধি স্কুলের সঙ্গে খেলার সময় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হত। মাঠ ভেঙে পড়ত দর্শকে। খেলায় জিতলে ছাত্রদের মতো মাস্টারমশাইরাও লাফঝাঁপ শুরু করে

দিতেন। বাঁশের বাঁটওয়ালা বড় ছাতা শূন্যে তুলে ধুতি-বাংলা শার্ট-পরা সংস্কৃতর শিক্ষক কানাইবাবুর লাফালাফি ছিল জয় উদ্‌যাপনের একটি পরিচিত দৃশ্য।

ক্লাবের খেলার মতোই স্কুলের খেলা নিয়েও মাঝেমধ্যে মাঠে গোলমাল দেখা দিত। আসলে এক-একটা স্কুল এক-একটা গ্রামেরই প্রতিনিধিত্ব করত। পাশাপাশি গ্রামের স্কুলের খেলায় গ্রাম-ভিত্তিক রেষারেষির প্রতিফলন পড়ত। রেফারি বা লাইন্সম্যানের ভুল সিদ্ধান্ত থেকে কখনো-সখনো শুরু হয়ে যেত গণ্ডগোল। ষাটের দশকে একবার গোবিন্দপুর মাঠে বরোদাপ্রসাদ স্কুলের বিরুদ্ধে হরিনাভি স্কুলের নিশ্চিত গোল রেফারি অফ সাইড বলে বাতিল করে দেন। তা থেকে বিরাট গণ্ডগোল বেধে যায়। কোনও একজন ছাত্র রেফারির মাথায় জুতো দিয়ে মারে। রেফারি ছিলেন গোবিন্দপুরেরই বাসিন্দা। গ্রামের লোকেরা রে রে করে তেড়ে আসেন। হরিনাভির সবাই যে যার মতো পিঠটান দেন। যে ছেলেটি জুতো মেরেছিল তাকে কেউ খুঁজে পাননি। পরে জানা গেছিল, সে পাশে একটা গাছের ওপর উঠে বসেছিল। মাঠ ফাঁকা হওয়ার পর সে চুপি চুপি নেমে বাড়ি পালায়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী'র উপাদান হওয়ার যোগ্য এইরকম বহু ঘটনার সরস গল্প একসময় ছাত্র-শিক্ষকদের মুখে মুখে ঘুরেছে।

১৯৭৬ সালে হরিনাভি স্কুল ফুটবলে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। আন্তঃজেলা স্কুলগুলির খেলাতেও সেবার বিজয়ী দল ছিল হরিনাভি স্কুল। অতনু ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, চন্দ্রনাথ ঘোষ তখন স্কুলের হয়ে খেলেছিলেন। অতনু ভট্টাচার্যর সমসাময়িক আরেকজন দুর্দান্ত গোলরক্ষক ছিলেন প্রদীপ রায়। স্কুলদলে দু'জনের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া ছিল কঠিন। এর সাত বছর পর হরিনাভি স্কুল আনন্দবাজার পত্রিকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছিল। সাত ও আটের দশকে অধিকাংশ বছরই হরিনাভি স্কুল ছিল জেলায় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন।

স্কুলদল নির্বাচিত হত ট্রায়াল ম্যাচের মাধ্যমে। তবে আন্তঃক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতাতেই ভালো খেলোয়াড়রা আলাদা হয়ে যেতেন। ট্রায়ালে সবার নজর থাকত তাঁদের ওপরেই। মাস্টারমশাই ও ছাত্ররা সবাই ভিড় করে ট্রায়াল দেখতেন। নয়ের দশক পর্যন্ত ট্রায়ালের দিন অন্য ছাত্রদেরও কার্যত হাফছুটি হয়ে যেত।

ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা ফুটবলকে ছাপিয়ে যায় ১৯৮৩ সালে ভারত বিশ্বকাপ ক্রিকেট জেতার পর। তবে শীতকালীন ক্রিকেট খেলা রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে স্বাধীনতার পরপরই প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেতারে ক্রিকেটের বাংলা ধারাভাষ্য এই খেলাটিকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছিল। আটের দশক পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ প্রায় হত না বললেই চলে। গোটা দিন

ধরে খেলা হত। দুই ইনিংসে ফলাফল না হলে প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যার ভিত্তিতে জয় নির্ধারিত হত। খেলা হত টেনিস বলে। তবে আটের দশক থেকেই জেলা লিগে এখানকার বেশ কিছু ক্লাব খেলা শুরু করেছিল। সেই খেলাগুলি হত সীমিত ওভারের ডিউস বলের ক্রিকেট।

আটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সিএবি স্কুল ক্রিকেট চালু হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতায় হরিনাভি স্কুল অংশ নিতে থাকে। ১৯৮৭ সালে এই প্রতিযোগিতায় স্কুল দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, যিনি মাধ্যমিকে ও পরে উচ্চমাধ্যমিকেও পশ্চিমবঙ্গে 'প্রথম কুড়ি'র মধ্যে ছিলেন। সে বছর স্কুল এই প্রতিযোগিতায় জেলায় রানার্স হয়। এই বছরই কামরাবাদ স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টেও হরিনাভি স্কুল রানার্স হয়েছিল (এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল সিএবি টুর্নামেন্টের আগে)। সেই টুর্নামেন্টে অধিনায়কত্ব করেছিলেন পূর্ণেন্দু দত্তবর্মণ। তিনিই স্কুলের ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক। ভালো অলরাউন্ডার—মিডিয়াম পেস বল করতেন ও মিডল অর্ডারে ব্যাট করতেন। কামরাবাদ স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন হরিনাভি স্কুলের রাজকুমার চক্রবর্তী—এই স্মারকগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক। পরের বছর তিনিই ছিলেন স্কুল-দলের অধিনায়ক, সে বছরও স্কুল সিএবি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় হয়েছিল। এর পর স্কুল পেয়েছিল একজন মারকাটারি ব্যাটসম্যানকে। নাম বাবলু শর্মা। পাড়ায় পাড়ায় সীমিত ওভারের টুর্নামেন্ট সে সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেসব টুর্নামেন্টে রাজকুমার, পূর্ণেন্দু ও বাবলু শর্মা হয়ে গিয়েছিলেন তারকা খেলোয়াড়। বাবলু শর্মার হাত ধরে স্কুল সিএবি টুর্নামেন্টে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্টেডিয়ামে বাবলু শর্মার হাঁকানো বিরাট ছক্কাগুলো অনেকের স্মৃতিতে আজও অমলিন। সেই সময় সাউথ পয়েন্ট স্কুলকে একটি ম্যাচে পরাজিত করেছিল হরিনাভি স্কুল। সাউথ পয়েন্টের হয়ে খেলেছিলেন একজন প্রতিভাবান বাঁহাতি কিশোর—তাঁর নাম সৌরভ গাঙ্গুলী।

নয়ের দশকের শুরুতে আর-একটি স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল—থামস-আপ কাপ। সিএবি স্কুল ক্রিকেটে এক-একটি দলকে ৩৫ ওভার খেলতে হত, থামস-আপ কাপে ২০ ওভার। পরে বাড়িয়ে ২৫ ওভারের খেলা করা হয়েছিল। বাবলু শর্মার ব্যাটিং-এ ভর করে স্কুল থামস-আপ কাপেও জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালেও থামস-আপ কাপের ফাইনালে খেলেছিল হরিনাভি স্কুল। সেমিফাইনালে শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের বিরুদ্ধে হরিনাভি স্কুল দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে

নিয়েছিল। ফাইনালে জগদ্দল উমাচরণ স্কুলের কাছে হরিনাভি স্কুল পরাজিত হয়। সেই স্কুল দলের অধিনায়ক ছিলেন সৈকত চক্রবর্তী।

স্কুলের ক্রিকেট টিমে নাইন আর ইলেভেনের ছাত্ররাই মূলত সুযোগ পেত। সামনে বড় পরীক্ষা বলে টেন ও টুয়েলভের ছাত্ররা শীতকালীন ক্রিকেটে অংশ নিত না। তবে দু'একজন নির্ভীককে সব সময়েই পাওয়া যেত খেলার মাঠে। দু'জন খেলোয়াড় আরও নীচু ক্লাস থেকে স্কুল টিমে সুযোগ পেয়েছিলেন, খেলেছিলেন দীর্ঘদিন। একজন কুমার ভট্টাচার্য, ডানহাতি মিডিয়াম পেস বোলার, আর একজন ধূর্জটি মজুমদার, বাঁহাতি মিডিয়াম পেসার। কুমার আটের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত খেলেছিলেন, ধূর্জটি নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষদিক পর্যন্ত। পরবর্তীকালে কলকাতা মাঠেও সুপার ডিভিশনে অনেকদিন ক্রিকেট খেলেছিলেন ধূর্জটি।

ফুটবলের মতোই ক্রিকেটেও ট্রায়াল দিয়ে টিমে নির্বাচিত হতে হত। তবে ইন্টার-ক্লাস টুর্নামেন্ট থেকেই সবাই চিনে যেতেন ভালো ক্রিকেটার কারা। ইন্টার-ক্লাস টুর্নামেন্ট দু'টি বিভাগে ভাগ করে হত। ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট একটা বিভাগে। আরেকটা বিভাগে নাইন, ইলেভেন। প্রত্যেক সেকশন থেকে একটি করে দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। ডিসেম্বরের শুরুতে টেস্ট পরীক্ষার পর টেন-টুয়েলভের ছেলেদের আর পাওয়া যেত না। শীতের রোদ্দুরে বেঞ্চ পেতে মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরাও অনেক সময় খেলা দেখতেন। ফাইনালের দিন হাফছুটি, সারা স্কুল মাঠে হাজির।

হরিনাভি স্কুলে আটের দশকের শুরুতে টেবিল টেনিস বোর্ড কেনা হয়েছিল। একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই বেশি খেলত। কয়েকজন মাস্টারমশাই-ও ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে খেলতেন। এঁরা হলেন জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক সুবীর ঘোষ, ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক মশিউর রহমান এবং অবশ্যই শারীরশিক্ষার শিক্ষক দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য। ছাত্রদের টেবিল টেনিসে পারদর্শী করে তোলার জন্য এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র দেবপ্রিয় বসুকে কিছুদিন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল স্কুল। দেবপ্রিয় বসু টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টনে এই অঞ্চলের অদ্বিতীয় খেলোয়াড় ছিলেন, বিটিটিএ-এর প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনাল খেলেছিলেন তিনি।

দু'দিন ধরে স্পোর্টস হত স্কুলের মাঠে। নানা দূরত্বের দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প প্রতিযোগিতা হত। রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে প্রথম আধুনিক কৌশলে হাই জাম্প দিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন হরিনাভি স্কুলের শিক্ষক দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের তালিকায় অবশ্য বিখ্যাত অ্যাথলিট কেউ নেই। তবে স্পোর্টসের

মাঠেই ভালো খেলোয়াড়দের নজরে পড়েছে অনেক সময়। জীবন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *রাজপুর-সোনারপুর: অতীত ও ঐতিহ্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অমিত ভদ্র লিখেছেন, “আমি তখন স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে প্রাক্তন অলিম্পিয়ান এম এ সাত্তার ও বিজয় চ্যাটার্জী (বিজয়দা) অতিথি হিসেবে আসেন। সেই প্রতিযোগিতায় দৌড় এবং লং জাম্পে আমি প্রথম হই। পুরস্কার বিতরণের সময় সাত্তার সাহেব আমার ভুয়সী প্রশংসা করেন। ...সেই সময়েই বিজয়দার সঙ্গে আমার পরিচয়। চলার পথে এই ফুটবল-পাগল মানুষটি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।... এই বিজয়দার প্রচেষ্টায় পরে বিখ্যাত ফুটবলার পি কে কান্নানের তত্ত্বাবধানে আমি ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে যোগ দিই”। বার্ষিক স্পোর্টসের মাঠে অতিথি হয়ে এসেছেন বহু নক্ষত্র-খেলোয়াড়—ফুটবলার শৈলেন মান্না, অমল দত্ত, মেওয়ালাল, নায়ার, সুরজিত সেনগুপ্ত, গৌতম সরকার, কৃশানু দে, মইদুল ইসলাম, কৃষ্ণেন্দু রায় বা ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জী।

বছরে দু'বার মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের মধ্যে খেলা হত—একবার ক্রিকেট আর-একবার ফুটবল। সাত-আটের দশকে অনেক মাস্টারমশাই ধুতি পরেই খেলতেন। শেষ পর্যন্ত সব খেলাতেই মাস্টারমশাইরা জিততেন। মাস্টারমশাইরা জিতলে পরের দিন ছুটি। তাছাড়াও ছাত্ররা শ্রদ্ধাবশত শিক্ষকদের হারাতে চাইত না। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মাস্টারমশাই ও ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা হত ডিউস বলে। ১৯৮৩ সালে শিক্ষক কল্যাণ ভট্টাচার্য ডিউস বল লেগে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তারপর থেকে টেনিস বলে এই খেলা হয়ে আসছে।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য ছিলেন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস, ভলি—সব খেলাতেই তিনি অসম্ভব পারদর্শী ছিলেন। ভলিতে তিনি বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না। ফুটবলে তিনি পুরো দমে মাঠ চষে গোল করতেন বা রুখতেন, ক্রিকেটে বাউন্ডারির-পর-বাউন্ডারি মারতেন। দুর্গাবাবুর খেলাসংক্রান্ত একটি ঘটনা অনেকের স্মরণে আছে। হরিনাভি মাঠে হরিনাভি ক্লাবের ছেলেরাও খেলেন। একবার এমন একটি ক্রিকেট ম্যাচ হওয়ার কথা। হরিনাভি ক্লাবের ভালো ব্যাটসম্যানের অভাব রয়েছে। একজন স্কুলে এসে দুর্গাবাবুকে তাঁদের হয়ে খেলার অনুরোধ জানান। দুর্গাবাবু তাঁদের বলেন, প্রধানশিক্ষকের অনুমতি ছাড়া তিনি খেলতে যেতে পারেন না। ক্লাবের ছেলেরা তখন প্রধানশিক্ষক আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়কে গিয়ে ধরলে তিনি দুর্গাবাবুকে খেলার

অনুমতি দেন। দুর্গাবাবু মাঠে নেমে হাফ-সেঞ্চুরি করেন। হরিনাভি ক্লাব ম্যাচ জিতে যায়।

গোবিন্দপুর রত্নেশ্বর হাজরা স্কুলের স্বর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শিক্ষকদের ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। এই টুর্নামেন্টে হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকরা বিজয়ী হন। ফাইনালে হরিনাভি স্কুলের প্রতিপক্ষ ছিল আয়োজক গোবিন্দপুর স্কুল। খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয়েছিল টাই ব্রেকারে। দুর্গাবাবু টাই ব্রেকারে গোলকিপিং করেছিলেন। স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবীর ঘোষ, জীবনবিজ্ঞানের প্রবীণ শিক্ষক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন নবীন মাস্টারমশাই। টাই ব্রেকারে তাঁরা দু'জন ও দুর্গাবাবু তিনটি গোল দিয়েছিলেন। অন্যদিকে গোবিন্দপুর স্কুলের প্রথম তিনটি শট রুখে দিয়ে দুর্গাবাবু হয়ে গিয়েছিলেন ম্যাচের নায়ক।

দুর্গাবাবুর সমসাময়িক শারীরশিক্ষার আর-এক শিক্ষক ছিলেন অরূপ মণ্ডল। নিজে প্রতিশ্রুতিমান ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন, পায়ে আঘাত পাওয়ায় তাঁকে ফুটবল মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। দুর্গাবাবুর আগে জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন শারীরশিক্ষার নাম-করা শিক্ষক। আরও আগে শারীরশিক্ষার জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন সমরেন্দ্রনাথ বসু। হরিনাভি স্কুল যে খেলাধুলায় এই রাজ্যের অন্যতম সেরা স্কুল হতে পেরেছিল তার পিছনে এঁদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। স্কুল কর্তৃপক্ষ-ও খেলাধুলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। জীবন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *রাজপুর-সোনারপুর: অতীত ও ঐতিহ্য* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রশান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, "খেলার ব্যাপারে আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে লাস্ট পিরিয়ডে ক্লাস করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, যাতে আমি সময় মত মাঠে পৌঁছোতে পারি"। এমন দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না।

২০০০ সালের পরবর্তীকালে খেলাধুলার দিকটি অনেকটাই উপেক্ষিত হতে থাকে। সিলেবাসে খেলাধুলা বা শারীরশিক্ষার তেমন গুরুত্ব ছিল না। স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ক্লাসের পঠনপাঠনের ওপর খুবই জোর দিতেন, স্কুলের সময়ের মধ্যে ছাত্রদের খেলাধুলার ওপর তিনি রাশ টেনে ধরেন। এর প্রভাব ছাত্রদের ক্রীড়াদক্ষতার ওপরও পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে ইদানীং হরিনাভি স্কুল আবার খেলার মাঠে সাফল্য লাভ করছে। ২০১৬ সালে স্কুলের দেড়শো বছর উপলক্ষে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে হরিনাভি স্কুল বিজয়ী হয়েছে। ফাইনালে তারা হারিয়েছে কামরাবাদ স্কুলকে। এই টুর্নামেন্টে হরিনাভি স্কুল-দলের প্রশিক্ষক ছিলেন এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন নামী গোলরক্ষক শান্তনু সোম।

(এই লেখাটি মূলত কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা। হরিনাভি স্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুবীর ঘোষ অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। লেখা সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এই স্কুলের আর-এক প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষক শ্যামলকিশোর ভট্টাচার্য-র সঙ্গে এই বিষয়ে কিছু কথা হয়। তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে দু'য়েকটি তথ্য সংযোজন করেছি। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে খ্যাতনামা প্রাক্তন স্টপার অমিত ভদ্র ও প্রাক্তন গোলরক্ষক শান্তনু সোমের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। বিশেষ করে শান্তনু সোমের সাহায্য ছাড়া এ লেখা তৈরি করা হয়তো সম্ভব হত না। বর্তমান গ্রন্থের স্মৃতিচারণগুলি আমি ব্যবহার করেছি। এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্তী নিজে স্কুলের ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন, তিনিও অনেক তথ্য দিয়েছেন। তবে মনে রাখা দরকার, স্মৃতি-নির্ভর তথ্য সব সময় নির্ভরযোগ্য নয়। সাল-তারিখ, ঘটনাক্রম স্মৃতিতে প্রায়শই একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়। এই লেখা সেই ধরনের ভ্রান্তিদোষ থেকে মুক্ত বলে দাবি করতে পারি না। আর অনিবার্যভাবেই এই লেখা অসম্পূর্ণ। আরও অনেক মানুষ আরও অনেক কিছু জানেন, যাঁদের কাছে পৌঁছোতে পারিনি। কেউ যদি নতুন কোনও তথ্য দিয়ে বা এই লেখার ভ্রান্তি দর্শিয়ে সাহায্য করেন তাহলে উপকৃত হব। —লেখক)